banglabook.com

বিরক্ত করে না।

সেদিন সফদর আলীর সাথে চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে পীরের উপদ্রব নিয়ে কথা হচ্ছিল। কী ভাবে দুই পীরের ভক্তেরা দলাদলি শুরু করেছেন এবং দুই দলের টানাটানিতে আমাদের কী ভাবে দম বের হয়ে যাচ্ছে, সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম।

সব শুনেটুনেও সফদর আলী ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না, জিজ্ঞেস করলেন, পীরদের কি কোনো পরীক্ষা পাস করতে হয়?

আমি হাসি গোপন করে বললাম, না।

তাহলে আপনি বুঝবেন কেমন করে যে সে পীর?

ব্যাপারটা হচ্ছে বিশ্বাস।

তাহলে আপনি কেন একজনকে বিশ্বাস করবেন, আরেকজনকে অবিশ্বাস করবেন?

আমাকে তখন সফদর আলীকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে হয়। বিশ্বাস অর্জনের জন্যে সবসময়েই পীরদের সম্পর্কে অলৌকিক কাহিনী ছড়ানো হয়। সাধারণ মানুষের অনেক সমস্যা থাকে, অলৌকিক জিনিস বিশ্বাস করতে তাদের এতটুকু দেরি হয় না। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই অলৌকিক ঘটনাগুলো কখনো কেউ যাচাই করার চেষ্টা করে না। আমি এখন পর্যন্ত একটি মানুষকেও পাই নি যে বলেছে সে নিজে একটি অলৌকিক ঘটনা দেখেছে। সবসময়েই শোনা ঘটনা, ওমুকের বড় ভাইয়ের শালা বলেছেন, ওমুকের ভায়রা ভাই নিজের চোখে দেখেছেন। ওমুক অফিসের বড় সাহেব করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এক জন দু'জন যে নিজের চোখে দেখেছেন বলে দাবি করেন নি তা নয়। কিন্তু চেপে ধরার পর সবসময়েই দেখা গেছে হয় মিথ্যে না হয় অতিরঞ্জন। একবার দুবার নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে আমি পীরদের কাছে গিয়েছি। কিন্তু সময় এবং পয়সা নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো লাভ হয় নি।

সফদর আলীর তখনো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় না, মাথা চুলকে বললেন, তাহলে এক জন মানুষ কেন পীর হয়ে যায়?

পীরদের বাড়ি দেখেছেন কখনো?

না।

দেখলে আপনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন, পাকা দালান, ফ্রিজ, টেলিভিশন ছাড়া পীর নেই। পীরদের চেহারা দেখলে আপনি বোকা বনে যাবেন, দুধ-ঘি খেয়ে একেকজনের অন্তত আড়াই মণ ওজন এবং গায়ের রঙ গোলাপি। এই বাজারে এত আরামে কয়জন থাকতে পারে? একবার একটা ভালো পীর যদি হয়ে যেতে পারেন, কয়জন বড় পুলিশ, আর্মি অফিসারকে মুরীদ করে নিতে পারেন, আর কোনো চিন্তা নেই।

সফদর আলী চিন্তিত মুখে চুপ করে খানিকক্ষণ কী একটা ভাবলেন, তারপর বললেন, তার মানে যত পীর দেখা যায় সবাই আসলে দুষ্টু লোক?

তা নির্ভর করে আপনি দুষ্টু লোক বলতে কী বোঝান তার ওপর। তবে হ্যাঁ, যারা লোক ঠকায় তারা দুষ্টু লোক ছাড়া আবার কী?

সবাই লোক ঠকায়?

আপনি কোনো গরিব পীর দেখেছেন? দেখেন নি—কারণ গরিব পীর নেই। যে-পীরের যত নামডাক সেই পীরের তত বেশি টাকাপয়সা, টাকাপয়সাটা আসে কোথা থেকে? পীরদের কখনো তো চাকরিবাকরি করতে দেখি না।

তার মানে আসলে সত্যিকার কোনো পীর নেই?

নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তারা কখনো চাইবে না লোকজন তাদের কথা জেনে ফেলুক, কাজেই তাদের দেখা পাওয়া মুশকিল।

সফদর আলী চিন্তিত মুখে চুপ করে থাকেন।

সৌভাগ্যক্রমে অফিসে পীরসংক্রান্ত উচ্ছ্বাস চরমে ওঠে, তারপর আস্তে আস্তে ভাটা পড়তে শুরু করে। সবকিছুরই এরকম নিয়ম, এক জিনিস নিয়ে আর কত দিন থাকা যায়? যারা পীরদের কাছে যায় সবারই কোনো-না-কোনো সমস্যা থাকে, প্রথম প্রথম তাদের প্রবল বিশ্বাস থাকে যে পীর তাদের সমস্যার সমাধান করে দেবেন। পীর কখনোই সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। তীব্র বিশ্বাস নিয়ে তবু মুরীদেরা কিছুদিন ঝুলে থাকে। তারপর একসময় উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ে আসে। এবারেও তাই, আমি দেখতে পাই হযরত খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরী এবং হযরত নুরে নাওয়াজ নকশবন্দীর মুরীদদের উচ্ছ্বাস আস্তে আস্তে কমতে থাকে। তাই একদিন ভোরে অফিসে এসে যখন দেখতে পাই যোগ ব্যায়ামের মাহাত্ম্য দেখানোর জন্যে সেকশান অফিসার ইদরিস সাহেব ছোট একটা হাফ প্যান্ট পরে খালি গায়ে মেঝেতে শুয়ে আছেন, আর লিকলিকে আকমল সাহেব তাঁর পেটের ওপর খালি পায়ে লাফাচ্ছেন, আমার বেশ ভালোই লাগল। পীর-ফকিরের ওপর অন্ধবিশ্বাস থেকে কোনো একটা কিছু প্রমাণ করার জন্যে হাতে-কলমে চেষ্টা করা অনেক ভালো।

ধীরে ধীরে অফিসটা আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছিল, মোহররমের মাসটা পর্যন্ত চাঁদা না দিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছিলাম কিন্তু তার মাঝে গোলমাল বেধে গেল, সত্যি কথা বলতে কি বেশ বড় গোলমাল। একদিন ভোরে অফিসে এসে দেখি টাইপিস্ট সুলতান সাহেবের টেবিল ঘিরে একটা ভিড়। ভিড় দেখলে আমি যোগ না দিয়ে পারি না। এবারেও ভিড়ে গেলাম। সুলতান সাহেব এক জন নতুন পীরের খোঁজ এনেছেন। এই পীরের অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুলতান সাহেবের বড় ভাই নিজের চোখে দেখে এসেছেন। এই পীর নাকি জিকির করতে-করতে একসময় বেহুঁশ হয়ে পড়েন। তাঁর আত্মা তখন উচ্চমার্গে চলে যায় এবং সারা শরীর থেকে চল্লিশ ওয়াট বাল্‌বের মতো আলো বের হতে থাকে। এরকম অবস্থায় তিনি সবরকম ব্যথা-বেদনার উর্ধ্বে চলে যান, তখন তাঁকে আগুনের উপর ফেলে দিলে তিনি টের পান না। চাকু দিয়ে আঘাত করলে চাকু পিছলে যায়। দা দিয়ে কোপ দিলে দা ছিটকে আসে—তাঁর কিছু হয় না। আধঘন্টা তাঁকে আগুনের ভেতর ফেলে রাখা হয়েছিল। যখন আগুন নিভে গেল, দেখা গেল চোখ বন্ধ করে মুখে হাসি নিয়ে জিকির করছেন।

সুলতান সাহেবের গল্প শেষ হতেই সবাই আমার মুখের দিকে তাকায়। এত দিনে সবাই জেনে গেছে আমি অবিশ্বাসী। ওয়ালী সাহেব বলেন, কিন্তু আপনি যে সবসময় অবিশ্বাস করেন, এখন কী বলবেন?

আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, ওসব গালগল্পে কান দেবেন না। সুলতান সাহেব যদি নিজের চোখে দেখে আসতেন, তবু একটা কথা ছিল।

banglabook.com

সুলতান সাহেব রেগে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন, তার মানে আপনি বলতে চান আমার বড় ভাই মিথ্যা কথা বলেছেন?

ঝগড়া লেগে যাবার মতো অবস্থা, আমি তাড়াতাড়ি নিজের টেবিলে ফিরে আসি।

পরদিন ভোরে অফিসে ঢোকার আগেই সবাই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুলতান সাহেব সবার আগে। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, এখন কী বলবেন?

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?

বলছিলেন আমার ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করেন না, এখন কী বলবেন? কাল আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।

আমি সত্যি সত্যি অবাক হলাম, এসব অলৌকিক জিনিস কেউ নিজের চোখে দেখে এসেছে, সেরকম ঘটনা বিরল। জিজ্ঞেস করলাম, কী দেখেছেন?

সুলতান সাহেব উৎসাহে টগবগ করতে থাকেন, আপনাদের মতো অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করল কি না করল তাতে কী আসে যায়? কিছু আসে যায় না।

আমি বললাম, তবু শুনি।

আমি গিয়েছি সন্ধ্যার পর, হাজার লোক, তার সামনে বসে হুজুর জিকির করছেন। এক ঘন্টা জিকির করলেন, তারপর, হঠাৎ বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। হাত-পা থরথর করে কাঁপতে থাকে—দশজন মিলে ধরে রাখা যায় না। চোখে-মুখে কেমন একটা আলো আলো ভাব। কোনোরকম ব্যথা-বেদনা নেই—কথা বলতে-বলতে সুলতান সাহেবের চোখ-মুখ থেকেই কেমন একটা আলো বের হতে থাকে।

আমি মাথা চুলকে বললাম, কী ভাবে বুঝলেন, ব্যথা-বেদনা নেই?

সুলতান সাহেবের মুখ আমার প্রতি অবজ্ঞায় বেঁকে যায়। মুখটা বাঁকা রেখেই বললেন, নিজের চোখে দেখুন এবার, ভাইয়ের কথা তো বিশ্বাস করলেন না, ফিরিশতার মতো বড় ভাই আমার। যখন হুজুর বেহুঁশ হয়ে গেলেন তখন একটা বড় চৌকি আনা হল। চৌকির ওপরে কী জানেন?

কি?

পেরেক। ছয় ইঞ্চি পেরেক। খাড়া হয়ে আছে—একটা নয়, দুইটা নয়, শত শত পেরেক, দেখলে ভয়ে দম বন্ধ হয়ে যায়। হুজুরের সাগরেদরা হুজুরকে তুলে এনে সেই পেরেকের উপর ফেলে দিলে ভয়ে আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। মনে হল চোখ খুললে দেখব শরীরটা মোরব্বার মতো গেঁথে গেছে পেরেকে। রক্তারক্তি ব্যাপার। ভয়ে-ভয়ে চোখ খুলেছি, কী দেখলাম জানেন?

সবাই এর মাঝে কয়েকবার গল্পটা শুনেছে, তবু উৎসাহের অভাব নেই, কয়েকজন একসাথে জিজ্ঞেস করলেন, কি?

দেখলাম হুজুর খাড়া পেরেকের উপর ভেসে আছেন, চোখ বন্ধ। কিন্তু মুখে হাসি। পেরেকের বিছানা না, যেন গদির বিছানা।

আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

সুলতান সাহেব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাসলেন, কী বলছি এতক্ষণ? নিজের চোখে দুই হাত দূরে বসে দেখেছি। দুই হাতের এক ইঞ্চি বেশি নয়।

আজিজ খাঁ বললেন গল্পটা শেষ করেন, আসল ব্যাপারটাই তো এখনো বললেন

না।

সুলতান সাহেব মুখে একটা আলগা গাম্ভীর্য নিয়ে এলেন, অবিশ্বাসী মানুষকে বলে লাভ কি? যার বিশ্বাস হবে না, খোদা তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও বিশ্বাস হবে না।

তবু বলেন।

সুলতান সাহেব আমার দিকে তাকালেন, শুনতে চান?

বলেন, শুনি।

শোনেন তাহলে। যখন দেখলাম হুজুর সেই পেরেকের বিছানায় শুয়ে আছেন, আমার তখন হুজুরের ক্ষমতার উপরে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার মতো একজন দু'জন মানুষ কি আর নেই? তাদের ভেতরে তো সন্দেহ থাকে। তাদের সন্দেহ মেটানোর জন্যে এক জন সাগরেদ একটা বড় তক্তা নিয়ে এসে হুজুরের বুকের উপর রাখলেন। তক্তার উপরে রাখলেন দুইটা থান ইট, দেখে ভয়ে তো আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়! ঘটনাটা মনে করে সুলতান সাহেব সত্যি দম বন্ধ করে ফেললেন।

বলুন, বলুন, অন্যেরা সুলতান সাহেবকে থামতে দেন না।

হুজুরের বুকের উপর ইট রেখে সাগরেদ নিয়ে এল একটা মস্ত হাতুড়ি। কিছু বোঝার আগে হাতুড়ি তুলে দিল হুজুরের বুকে প্রচণ্ড এক ঘা। ইট দুইটা ভেঙে টুকরা-টুকরা, হুজুর কিছু জানেন না, চোখ বন্ধ করে জিকির করে যাচ্ছেন।

সমবেত শ্রোতাদের বুকের ভেতর থেকে আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের হয়ে আসে। সুলতান সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন আপনি কী বলতে চান?

মাথা চুলকে বললাম, নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত—

তার মানে আপনি বলতে চান আমি মিথ্যা কথা বলছি?

না না, তা বলছি না। যেহেতু আপনার এত বিশ্বাস, হয়তো অনেক খুঁটিনাটি জিনিস আপনার চোখে পড়ে নি, নিজের চোখে দেখলে বুঝতে পারব।

মাওলা সাহেব বললেন, তার মানে আপনি বলছেন এটা বুজরুকি?

নিজে না দেখে কিছু বলব না। অবিশ্বাস্য জিনিস দেখলেই সেটা বিশ্বাস করা ঠিক না। ম্যাজিশিয়ানরা মানুষ কেটে জোড়া লাগিয়ে ফেলে। তার মানে কি ম্যাজিশিয়ানরা পীর?

অফিসের সবাই এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যে, তাদের ভেতর যদি বিন্দুমাত্র ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকত, আমি ভস্ম হয়ে যেতাম!

পরের কয়দিন আমি নিয়মিত সেই পীরের আস্তানায় যাওয়া শুরু করলাম। অবিশ্বাস্য হলেও সুলতান সাহেব এতটুকু বাড়িয়ে বলেন নি। সত্যি সত্যি সেই পীর সুচালো পেরেকের উপরে শুয়ে থাকেন। সাগরেদরা বুকে থান ইট ভেঙে টুকরা-টুকরা করে ফেলেন, পীরের কোনোরকম অসুবিধে হয় না। শুধু তাই নয়, একদিন দেখি বড় বড় কাঠের টুকরা পুড়িয়ে গনগনে আগুন করা হল, সাগরেদরা কোনোভাবে সেই পীরকে আগুনের উপর দাঁড় করিয়ে দিল, পীর খালিপায়ে ঐ আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে গেলেন, অবিশ্বাস্য ব্যাপার, নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। অনেকের সাথে সাথে আমিও পীরের পায়ের তলা দেখে এসেছি, ফোস্কা দূরে থাকুক, একটু চিহ্ন পর্যন্ত নেই। দেখে শুনে

আমিও হতবাক হয়ে যাই, বিশ্বাসও প্রায় করে ফেলেছিলাম, কিন্তু শেষ অংশটুকু এখনো কোথায় জানি সন্দেহ জাগিয়ে রেখেছে। প্রতি রাতের একই ব্যাপার। সবকিছু শেষ হয়ে গেলে পীর আধা বেহুঁশ হয়ে একটা গদিতে পড়ে থাকেন, তখন ভক্তেরা একে একে আসতে থাকে, পীর বাবার পা ধরে নিজেদের দুঃখ-কষ্ট-সমস্যার কথা বলে যায়। পীর বাবা কাউকে একটা লাথি দেন, কাউকে একটু চাল পড়া দেন, কাউকে এক টুকরো কয়লা, আবার কারো জন্যে একটু দোয়া করে দেন। ভক্তেরা হুজুরের পায়ের কাছে বড় গামলাতে সামর্থ্যমতো টাকাপয়সা ফেলে যায়। হুজুর এবং তাঁর সাগরেদরা আড়চোখে দেখেন কে কত টাকা দিল। টাকার অঙ্ক বেশি হলেই তাদের মুখের হাসিটি বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভক্তের খাতির-যত্নও হয় বেশি, পীর বাবা লাথি না দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। দেখতে-দেখতে গামলা ভরে ওঠে টাকায়। প্রতি রাতে অন্তত হাজারখানেক টাকা কিংবা আরো বেশি। এইখানেই আমার সন্দেহ, ঐশ্বরিক ব্যাপারের সাথে সাথে টাকাপয়সার ব্যাপারটি ঠিক খাপ খায় না—সত্যিকারের সিদ্ধপুরুষের টাকাপয়সার কী দরকার?

অফিসে যারা হযরত শাহ্ খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরী এবং হযরত নূরে নাওয়াজ নকশবন্দীর মুরীদ ছিলেন, তাঁরা সবাই এখন এই নতুন পীর হামলা বাবা বিক্রমপুরীর মুরীদ হয়ে গেলেন। সুলতান সাহেবের দীর্ঘদিন থেকে অম্বলের ভাব, সেদিন পীর সাহেবের চাল-পড়া খাবার পর থেকে নাকি চোঁকা ঢেকুরের সংখ্যা অর্ধেকের বেশি কমে গেছে। মাওলা সাহেবের পিঠে ব্যথা, সেদিন হামলাবাবার একটা লাথি খাওয়ার পর থেকে ব্যথার কোনো চিহ্ন নেই। আজিজ খাঁয়ের ছোট ছেলের হুপিং কাশ, বাবার তেল-পড়া বুকে মাখিয়ে দেয়ার পর থেকে কাশির কোনো চিহ্ন নেই। প্রতিদিনই এরকম নতুন নতুন ঘটনা শুনতে থাকি। এবারে আর শোনা ঘটনা নয়, সব চাক্ষুষ ঘটনা। অফিসের বিশ্বাসী লোকজনের খোঁচায় আমার অফিসে কাজ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। অবস্থাচক্রে মনে হয় আর কয়দিন দেখে-শুনে আমিও হয়তো হামলা বাবার পা চেপে ধরে মুরীদ হয়ে যাব।

চায়ের দোকানে সফদর আলীর সাথে আমি সে কথাটাই বলছিলাম। অলৌকিক কিছু হতে পারে না, আজীবন বিশ্বাস করে এসেছি, এখন হঠাৎ চোখের সামনে এরকম অবিশ্বাস্য জিনিস দেখে মানুষের ক্ষমতাকে অবিশ্বাস করি কেমন করে? হয়তো সুলতান সাহেবের কথাই ঠিক, মানুষ হয়তো দীর্ঘদিন তপস্যা করে সত্যি সত্যি অলৌকিক শক্তি অর্জন করে ফেলে।

আমি সফদর আলীকে সবকিছু খুলে বললাম, শুনে তিনি খুব অবাক হলেন বলে মনে হল না। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, যে চৌকিতে তাকে শোওয়ানো হয় সেখানে পেরেকের সংখ্যা কত?

অনেক, গুনে তো দেখি নি!

তবু, আন্দাজ?

এক আঙুল পরপর হবে, পাঁচ ছয় শ' কী এক হাজার!

সফদর আলী মাথা নেড়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে কী একটা হিসেব করলেন। তারপর মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, পীর সাহেবের বুকের উপর যে-ইটটাকে হাতুড়ি দিয়ে মারা হয়, সেটা ভেঙে যায় তো?

হ্যাঁ।

কয় টুকরা হয়?

অনেক, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়।

সফদর আলী আরো কিছুক্ষণ কী একটা হিসেব করে বললেন, যখন গনগনে কয়লার উপর দিয়ে হাঁটে, তখন কি আস্তে আস্তে হাঁটে না তাড়াতাড়ি?

তাড়াতাড়ি, বেশ তাড়াতাড়ি।

হাঁটার আগে কি পা পানিতে ভিজিয়ে নেয়?

আমি মাথা চুলকে মনে করার চেষ্টা করি। পা ভিজিয়ে নেয়ার কথা মনে নেই, কিন্তু মনে হল সাগরেদরা তাকে ওজু করিয়ে দেয়। শুনে সফদর আলী একটু হাসলেন, পকেট থেকে কী একটা ছোট বই বের করে সেখান থেকে কী সব টুকে নিয়ে কী একটা হিসেব করে হঠাৎ খিকখিক করে হাসতে থাকেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল?

ব্যাটা এক নম্বর চোর।

কে?

আপনার পীর বাবা।

কেন?

এই দেখেন। সফদর আলী তাঁর নোটবইটা দেখালেন, সেখানে অনেকরকম হিসেব, নিচে এক জায়গায় লেখা, (২০০ + ১০০০) × ২ = চোর (৬০০ + ১০,০০০) + ১০০ =মহাচোর।

আমি খানিকক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থাকি। এরকম অঙ্ক কষে চোর মহাচোর বের করতে দেখা এই প্রথম। সফদর আলীর দিকে অবাক হয়ে তাকাতেই তিনি বললেন, বুঝতে পারলেন না? ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিই।

সফদর আলীর বেশ কিছুক্ষণ লাগল আমাকে বোঝাতে। মাথাটা বরাবরই আমার একটু মোটা। এসব জিনিস বুঝতে আমার একটু সময় লাগে। কিন্তু এক বার বুঝিয়ে দেয়ার পর আমারও কোনো সন্দেহ থাকে না যে, পীর বাবা আসলে একটা চোর ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যাপারটি এরকম, এক জন মানুষের ওজন খুব বেশি হলে হয়তো দেড় শ' পাউন্ড হয়, আমাদের পীর বাবার কথা অবশ্যি আলাদা। ঘি–মাখন খেয়ে দু' শ' পাউন্ডের এক ছটাক কম নয়। তিনি যখন সূচালো পেরেকের বিছানার উপর শুয়ে থাকেন, তখন এই পুরো ওজনটি প্রায় হাজার খানেক পেরেকের উপর ভাগ হয়ে যায়। পুরো ওজনটি যদি একটি মাত্র পেরেকের ওপর দেয়া হত, পেরেকটি সাথে সাথে শরীর ফুটো করে ঢুকে যেত, কিন্তু সেটি কখনো করা হয় না। হাজারখানেক সূচালো পেরেককে দেখতে ভয় লাগে ঠিকই, কিন্তু একেকটি পেরেকে মাত্র কয়েক আউন্স করে চাপ পড়ে। সেটি কিছুই নয়। যে কোনো মানুষ একটি পেরেকের মাথায় কয়েক আউন্সের চাপ সহ্য করতে পারে, এমনকি ঘি–দুধ–খাওয়া পীরসাহেব পর্যন্ত। বুকের উপর থান ইট ভেঙে ফেলা ব্যাপারটি শুধু দেখতেই ভয়ংকর, আসলে কিছু না, হাতুড়ি দিয়ে ঘা মেরে যেটুকু শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তার বেশিরভাগই খরচ হয়ে যায় ইটটাকে ভাঙতে। বাকিটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে পেরেকের উপরে চাপ আরো আউন্সখানেক বাড়িয়ে দেয়, সেটা এমন কিছু নয়। গনগনে কয়লার উপরে হাঁটা

ব্যাপারটা একটু জটিল, একটু বিপজ্জনকও। জ্বলন্ত কয়লার তাপমাত্রা ছয় সাত শ' ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সেটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে জিনিসটা কয়লা। কয়লার ওজন কম। কাজেই এর তাপ ধারণ করার ক্ষমতাও কম। কাজেই কেউ যদি জ্বলন্ত কয়লার উপরে চাপ দেয়, খুব বেশি তাপ পায়ে এসে পৌঁছাতে পারে না। কয়লা পা-কে পোড়ানোর আগেই পা কয়লাকে ঠাণ্ডা করে দেয়। কয়লার ভিতরের তাপ পা পর্যন্ত পৌঁছুতে একটু সময় লাগে, কিন্তু খুব দ্রুত হেঁটে গিয়ে সেই সময়টুকুও কয়লাকে দেয়া হয় না। তা ছাড়া যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে পা পানিতে ভিজিয়ে নেয়া। তাই যখন জ্বলন্ত কয়লায় পা দেয়া হয়, পায়ের তলার পানি বাষ্পীভূত হয়ে পায়ের তলায় বাষ্পের একটা খুব সূক্ষ্ম আস্তরণ তৈরি করে ফেলে। বাষ্পের আস্তরণ, সেটা যত সূক্ষ্মই হোক, তার ভিতর দিয়ে তাপ খুব ভালোভাবে যেতে পারে না। সফদর আলী ব্যাপারটাকে হাতে-কলমে দেখালেন। চায়ের দোকানের দোকানি তখন সিঙাড়া ভাজার জন্যে কড়াইটা গরম করছিল, বেশ গনগনে গরম কড়াই, সফদর আলী তার উপর কয়েক ফোঁটা পানি ফেলে দিলেন। সেগুলো সাথে সাথে বাষ্পীভূত না হয়ে খানিকক্ষণ কড়াইয়ের উপর দৌড়ে বেড়াল। পানির ফোঁটার নিচে বাষ্প, তাপ সেই বাষ্পের আস্তরণ ভেদ করে পানিতে পৌঁছাতে পারছে না বলে পানি বাষ্পীভূত হচ্ছে না। ভারি মজার ব্যাপার।

সফদর আলীর ব্যাখ্যা শুনে আমার আনন্দে নাচতে ইচ্ছা করে, সারা জীবন বিশ্বাস করে এসেছি পৃথিবীতে অলৌকিক বা ব্যাখ্যার অতীত কিছু নেই। সেই বিশ্বাস ছেড়ে দিতে হলে খুব দুঃখের ব্যাপার হত। আমার আনন্দের বড় কারণটা অবশ্যি অন্য একটি ব্যাপার। সফদর আলীর এরকম বিজ্ঞানী মাথা, তিনি যখন এত সহজে ব্যাপারটি ধরে ফেলতে পারলেন, আরো সহজে হয়তো এমন একটা বুদ্ধি বের করতে পারবেন যে জোচ্চোর পীরকে হাতেনাতে ধরে ফেলা যাবে।

সফদর আলীকে সে কথাটি বলতেই তিনি প্রায় আঁৎকে উঠলেন। বললেন, না না না, সে কী করে হয়?

কেন?

বয়স্ক একটা মানুষকে এভাবে লজ্জা দেয়া ঠিক না।

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, ব্যাটা জোচ্চোর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দশজন নিরীহ মানুষের মাথা ভেঙে খাচ্ছে, সেটা দোষ নয়, আর তাকে ধরিয়ে দেয়া দোষ?

সফদর আলী প্রবল বেগে মাথা নাড়েন, তাই বলে বয়স্ক এক জন মানুষকে এভাবে লজ্জা দেবেন? সে কী করে হয়?

আমার অনেকক্ষণ লাগল সফদর আলীকে বোঝাতে যে, ব্যাপারটিতে কোনোরকম দোষ নেই, যদি তাকে ধরিয়ে না দেয়া হয় সে সারা জীবন সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে যাবে। প্রায় আধা ঘন্টা বোঝানোর পর তিনি রাজি হলেন। কী করে তার জোচ্চুরি ধরা হবে চিন্তা করে বের করতে তাঁর এক মিনিট সময়ও লাগল না। ব্যাপারটি এত সহজ যে আমি প্রথম বার শুনেই বুঝে ফেললাম। জোচ্চোর পীরের কী দুর্গতি হবে চিন্তা করে সফদর আলী আর হাসি থামাতে পারেন না। তিনি পারলে তখন-তখনি পীরের আস্তানায় রওনা দিয়ে দেন। আমি অনেক কষ্টে তাঁকে থামিয়ে রাখলাম, জোচ্চোরকে ধরার আগে একটু প্রস্তুতি দরকার।

পরের দুদিন আমার প্রস্তুতি নিতেই কেটে গেল। প্রথম প্রস্তুতি পীর বাবার আস্তানায়। পীরের বড় সাগরেদের সাথে একটু কথাবার্তা বলতে হবে। গত কয়েকদিন থেকে লক্ষ করছে আমি একেবারে সামনে এসে বসে আছি, কিন্তু কখনোই একটা পয়সাও পীর বাবার গামলাতে ফেলছি না। আজ আমাকে দেখেই তাই ভুরু কুঁচকে ফেলল, আমি আড়ালে ডেকে নিয়ে সরাসরি কাজের কথায় চলে এলাম। বললাম, আমি এক জন আলু ব্যবসায়ীর ম্যানেজার। আমার ব্যবসায়ী কালু খাঁর আলু ছাড়াও অন্য অনেকরকম ব্যবসা আছে, যেটা আমি চোখ টিপে জানিয়ে দিলাম যে কারো সাথে আলোচনা করতে চাই না। বললাম, ব্যবসায়ীর বিস্তর টাকা, ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা, আবার পীর–ফকিরে বিশ্বাস। ভালো পীর পেলে মুরীদ হয়ে পীর বাবার পায়ে লাখ–দু' লাখ টাকা দিয়ে দিতে চান, তাতে ধর্মেরও কাজ হয়, আবার ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলাটাও মেটে।

একটু শুনেই সাগরেদের চোখ চকচক করতে থাকে, আমাকে চেপে একটা চেয়ারে বসিয়ে এক জনকে চা আনতে পাঠিয়ে দেয়। আমি স্বরযন্ত্রীদের মতো গলা নামিয়ে বললাম, আমার ব্যবসায়ী কালু খাঁর একটামাত্র ভয়, একটা ভণ্ড পীরের পিছনে না টাকাটা নষ্ট হয়! আমি তাই অনেক দিন থেকে ভালো পীর খুঁজে বেড়াচ্ছি। যতগুলো দেখেছি সবগুলো ভণ্ড, এই প্রথম একটা খাঁটি পীর পেয়েছি—

সাগরেদ আমাকে থামিয়ে দিয়ে পীর বাবার প্রশস্তি শুরু করে, তিনি কোন পীরের আপন ভায়রা ভাই, কোন পীরের বড় শালা এবং কোন কোন পীরের সাক্ষাৎ জামাতা বলেই ক্ষান্ত হলেন না, পেরেকে শোওয়া এবং আগুনের উপর হাঁটা ছাড়াও তিনি আর কী কী করতে পারেন, খুলে বলতে শুরু করে। তাঁর চোখ নাকি এক্সরের মতো এবং তিনি কাপড় ভেদ করে দেখতে পারেন। তিনি জিন বন্দি করার দোওয়া জানেন এবং তাঁর শোওয়ার ঘরে ছয়টা হোমিওপ্যাথিকের শিশিতে নাকি ছয়টা জিন বন্দি করা আছে।

আমাকে ধৈর্য ধরে পুরো বক্তৃতাটা শুনতে হল, বক্তৃতা শেষ হলে তার সাথে পুরোপুরি একমত হয়ে আমি বললাম, পীর বাবার উপরে আমার বিশ্বাস ষোল আনার উপরে আঠার আনা, কালু খাঁ যদি শুধু একবার এসে দেখেন, সাথে সাথে মুরীদ হয়ে যাবেন। তবে—

তবে কি?

ব্যবসায়ী মানুষ, মনে সন্দেহ বেশি। কাজেই শুধু শুধু ঝুঁকি নিয়ে কাজ কী, যেদিন কালু খাঁ আসবেন, হুজুরকে একবার পেরেকের উপর শুইয়ে তারপর আগুনের উপর হাঁটিয়ে দেবেন, কালু খাঁ সাথে সাথে কাত হয়ে যাবেন।

সাগরেদ বললেন, এক শ' বার এক শ' বার। হুজুরের রুহের উপর কষ্ট হয়, তাই যেদিন হুজুর পেরেকের বিছানায় শুয়ে থাকেন সেদিন আগুনের উপরে হাঁটতে দিই না। তবে কালু খাঁ সাহেব যখন একটা ভালো নিয়ত করেছেন, না হয় হুজুরের রুহ একটু কষ্ট করলই।

আরো খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে আমি উঠে পড়ি। সাগরেদ অনেক ঘোড়েল ব্যক্তি, আমাকে জানিয়ে দিলেন কালু খাঁ সত্যি যদি লাখ দু' লাখ টাকা দিয়ে দেন,

আমাকে একটা পার্সেন্ট ধরে দেবে। শুধু তাই না, হুজুরের মুরীদ পুলিশের বড় অফিসার আছে, কালু খাঁর যদি প্রয়োজন হয় হুজুর বলে দেবেন, আইনের ভেতরের–বাইরের জিনিস নাকি তাহলে নাড়াচাড়া করে দেবে! শুনে আমি থ হয়ে যাই।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তুতিটি নেয়ার জন্যে খবরের কাগজের অফিসে যেতে হল। আমার এক পুরানো বন্ধু সেখানে সাংবাদিকতা করে, তবে মুশকিল হচ্ছে, তার কখনো দেখা পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজে মাঝরাতে তাকে ধরা গেল। আমাকে দেখে বলল, কী হল, আমাকে নাকি গরু–খোঁজা করছিস?

গরুকে গরু–খোঁজা করব না তো ছাগল–খোঁজা করব?

কি ব্যাপার?

তোর সাথে জরুরি দরকার।

কী কপাল আমার!

বুধবার সন্ধেবেলাটা আমার জন্যে রাখতে হবে।

কী জন্যে, ভাগ্নের জন্মদিন?

না না, ওসব নয়, এক পীরের আস্তানায় যেতে হবে।

বন্ধু মাথা চুলকে বলল, কিন্তু বুধবার যে আমার এক ফিল্ম স্টারের সাথে সাক্ষাৎকার!

সেসব আমি জানি না, বুধবার অবশ্যি অবশ্যি তোকে আসতে হবে, তোর ক্যামেরা, ফ্লাশ সবকিছু নিয়ে।

কোথায়?

পীর বাবার আস্তানায়, তোকে ঠিকানা দিয়ে দেব।

সাংবাদিক বন্ধু চোখ কপালে তুলে বলল, সে কী! তুই কবে থেকে আবার পীরের ভক্ত হলি?

আমি বললাম, সে তুই গেলেই দেখবি।

সাংবাদিক বন্ধু বলল, ঠিক আছে, আমি যেতে পারি, কিন্তু কোনো পীরের পাবলিসিটি করে আমি কিছু লিখতে পারব না।

সে তোর ইচ্ছ। আর শোন্, ওখানে গেলে খবরদার আমাকে দেখে চেনার ভান করিস না।

কেন?

কারণ ওখানে আমি আমি না, আমি হচ্ছি আলু ব্যাপারি কালু খাঁর ম্যানেজার।

বন্ধুটি কিছু না বুঝে আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল, আমি সে অবস্থাতেই বিদায় নিয়ে চলে আসি।

আমার দু'নম্বর কাজটি শেষ। তিন নম্বর কাজটি একটু কঠিন। পেরেকের বিছানায় শোওয়া এবং জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে হাঁটার রহস্যটা একটা কাগজে লিখে ফেলা। লেখালেখি ভালো আসে না আমার, বিস্তর সময় লেগে গেল। শুধু লিখেই শেষ নয়, সেটা আবার ফটোকপি করে শ'খানেক কপি করে ফেলতে হল, নিজের পকেটের পয়সা খরচ করেই!

শেষ কাজটি কঠিন নয়, কিন্তু বিপজ্জনক। পীর বাবার বুজরুকি ধরার জন্যে কিছু

banglabook.com

ছোটখাট ব্যবস্থা করা, তার আস্তানায় সেদিনই করতে হবে, আগে থেকে করে রাখার উপায় নেই। সফদর আলী অবশ্যি ভরসা দিয়েছেন তিনি ঠিক ঠিক করে নেবেন, ধরা পড়ে ভক্তদের হাতে মার খাওয়ার একটা আশঙ্কা আছে, কিন্তু মহৎ কাজে বিপদের ঝুঁকি না নিলে কোন মহৎ কাজটা করা যায়?

বুধবার সন্ধেবেলা আমি সময়মতো পীর বাবার দরবারে এসে হাজির হলাম। আসার সময় নিউ মার্কেটের সামনে থেকে একটা চালু গোছের বাচ্চাকে ধরে এনেছি, নাম নান্টু। তার সাথে কুড়ি টাকার চুক্তি, দশ টাকা অগ্রিম, বাকি টাকা কাজ শেষ হলে দেয়া হবে। কাজটি কঠিন নয়, পীর বাবার দরবারে যখন হৈচৈ লেগে যাবে, লোকজন চেঁচামেচি করতে থাকবে তখন ভেতরে ঢুকে "পীর বাবার জোচ্চুরি" "পীর বাবার জোচ্চুরি" বলে ফটোকপি করা কাগজগুলো বিলি করতে হবে। শুনে ছেলেটা মহাখুশি, হাতে কিল মেরে বলল, 'নদী মে খাল, মিরচা মে ঝাল!'

কথাটার মানে কি এবং কাগজ বিলি করার সাথে এর কি সম্পর্ক আমি বুঝতে পারলাম না। অবশ্যি বোঝার বেশি চেষ্টাও করি নি, ছোট বাচ্চাদের যদি বুঝতেই পারব, তাহলে ওরা আর বাচ্চা কেন?

পীর বাবার দরবারে ঢুকতেই বড় সাগরেদ একগাল হেসে এগিয়ে এলেন। গলার স্বর নিচু করে বললেন, খাঁ সাহেব এসেছেন?

আমি ভিড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, ওখানে বসে আছেন, এখন পরিচয় দিতে চান না। ভিড়টা কমে গেলে হুজুরের কাছে নিয়ে যাব।

সাগরেদের একটু আশাভঙ্গ হল বলে মনে হল, কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে আমার সাথে দীন, দুনিয়া এবং আখেরাত নিয়ে কথা বলতে থাকে। কথা বলতে বলতে আমি দরজার দিকে লক্ষ করছিলাম। সফদর সাহেবের আলাদাভাবে আসার কথা, তিনি এসে গেছেন। দরবারের কাছাকাছি পেরেকের চৌকিটা সাজানো আছে, একজন দু'জন সাহসী দর্শক কাছে এসে জিনিসটা ছুঁয়ে দেখছিল, লক্ষ করলাম সফদর আলীও দর্শকদের সাথে এসে চৌকিটার পেরেকগুলো টিপেটুপে দেখার অভিনয় করছেন, অত্যন্ত কাঁচা অভিনয়। ভালো করে লক্ষ করলে যে কেউ বুঝে ফেলবে! আমি বড় সাগরেদকে একটু ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু তার দরকার ছিল না, কারণ হঠাৎ দেখি সফদর আলী আগুনের কুণ্ডটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এর অর্থ পেরেকের চৌকিতে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। সফদর আলী আগুনের কুণ্ডর পাশে দাঁড়িয়ে সন্দেহজনকভাবে এদিকে-সেদিকে তাকাতে থাকেন, আমি শঙ্কিতভাবে দেখি এক জন সাগরেদ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। সাগরেদ সফদর আলীকে কী একটা জিজ্ঞেস করল। উত্তরে সফদর আলীও কী একটা বললেন। তারপর দু'জনে বেশ সহজভাবেই কথা বলতে থাকেন। সাগরেদ একটা লাঠি দিয়ে আগুনটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জ্বালাতে থাকে। সফদর আলীও তাকে সাহায্য করতে থাকেন। আমি ভয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকি, সাগরেদের এত কাছে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর কাজটা শেষ করতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যান, তাঁর কী অবস্থা হবে, আমি চিন্তা করতে পারি না। খানিকক্ষণ পর ভয়ে ভয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি ফিরে যাচ্ছেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই তিনি মুচকি হেসে

একটু মাথা নাড়লেন। বুঝতে পারলাম কাজ শেষ, আমার বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে যায়।

নির্দিষ্ট সময়ে পীর বাবা এসে দরবারে হাজির হন। চার ফুট লম্বা লাশ, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় সমান সমান। গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। গাল দুটিতে একটা গোলাপি আভা। মাথায় একটা জমকালো জরিদার পাগড়ি। পরনে সাদা সিল্কের পাঞ্জাবি। সাদা সিল্কের লুঙ্গি। পীর বাবা মুখে একটা মৃদু হাসি নিয়ে এসে মখমলের গালিচাতে বসলেন। সাথে সাথে উপস্থিত জনতার মাঝে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যায়—কে কার আগে এসে হুজুরের পা ধরে সালাম করতে পারবে। যাদের বাড়াবাড়ি একটু বেশি, তারা এসে হুজুরের পায়ের তলায় চুমো খাবার চেষ্টা করতে থাকে। হুজুর মুখে মৃদু হাসি নিয়ে ভক্তদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

একটু পরেই বড় সাগরেদ ঘোষণা করলেন যে, এখন হুজুর জিকির শুরু করবেন যাদের অজু আছে তারা হুজুরের সাথে জিকির শুরু করতে পারে।

হুজুরের সামনে মস্ত বড় কাঁচের গামলায় ঠাণ্ডা শরবত রাখা আছে, হুজুর সেখান থেকে একগ্লাস শরবত তুলে এক ঢোক খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে সুরেলা স্বরে জিকির শুরু করেন। মাহফিলের শ'তিনেক লোক তাঁর সাথে তাল রেখে গলা ফাটিয়ে জিকির শুরু করে, শব্দে মনে হয় ঘরের ছাদ ফেটে বেরিয়ে যাবে। আস্তে আস্তে জিকিরের তাল দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে, হুজুরের শরীর কাঁপতে থাকে, চোখ ঘুরতে থাকে এবং কিছু বোঝার আগে হঠাৎ দড়াম করে মখমলের গদিতে পড়ে গিয়ে গোঁ গোঁ করতে থাকেন। বড় সাগরেদ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতেই উপস্থিত জনতা মুহূর্তে চুপ করে যায়। হুজুর তখনো গদিতে গোঁ-গোঁ শব্দ করে কাঁপছেন, কয়েকজন সাগরেদ ছুটে এসে ভিজে তোয়ালে দিয়ে তাঁর মুখ মুছিয়ে পাখা দিয়ে খানিকক্ষণ বাতাস করার পর তিনি একটু শান্ত হন। বড় সাগরেদ গলা নামিয়ে বললেন, খবরদার, কেউ এখন জোরে শব্দ করবেন না, হুজুরের রুহ এখন অনেক উপরে চলে গেছে, তাঁর শরীরের সাথে এখন তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই। এখন হঠাৎ করে কেউ যদি হুজুরকে চমকে দেন তাঁর রুহ আর তাঁর শরীরে ফিরে নাও আসতে পারে। আপনারা একটুও শব্দ করবেন না, সবাই মনে মনে আল্লাহ্‌কে ডাকেন।

লোকজন শঙ্কিত পাংশু মুখে আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে।

বড় সাগরেদ বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গিতে আবার শুরু করেন, হুজুরের শরীরে এখন ব্যথা-বেদনা নেই। কী ভাবে থাকবে, শরীরে যদি রুহ না থাকে সেখানে ব্যথা-বেদনা কোত্থেকে আসবে? আপনারা যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে এক্ষুনি দেখবেন, হুজুরের শরীরকে খাড়া পেরেকের উপর রেখে দেব, হুজুর তার উপর যেন ভেসে থাকবেন।

হুজুরের ইয়া লাশ, ঘি-দুধ খেয়ে মোটা খোদার ইচ্ছায় একটু বেশিই হয়ে গেছেন, চর্বির জন্যে তাঁকে ভালো করে ধরা যায় না, পিছলে যেতে চান। তাঁকে টেনে আনতে গিয়ে দশ বার জন মুশকো জোয়ানের কালঘাম ছুটে গেল। হুজুরকে কোনোমতে টেনে এনে সেই পেরেকের বিছানাতে শোওয়ানোমাত্র একটা মজার জিনিস ঘটে গেল, হুজুর হঠাৎ "বাবা গো" বলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ার চেষ্টা করেন। লোকজনের ভেতর একটা বিস্ময়ের গুঞ্জন শুরু হয়ে হঠাৎ থেমে যায়। সাগরেদরা হতভম্ব। বড় সাগরেদ সবচেয়ে আগে সম্বিত ফিরে পান, ভয়ের ভঙ্গিতে বললেন, নাউজুবিল্লাহ্

নাউজুবিল্লাহ্ নাউজুবিল্লাহ্—আপনারা দরুদ শরিফ পড়েন, সবাই জোরে জোরে দরুদ শরিফ পড়েন, জোরে জোরে।

দরুদ শরিফের আওয়াজে আর কিছু শোনা যায় না, পীর সাহেবের কাতোরক্তি চাপা পড়ে গেল। পীর বাবা লাফিয়ে উঠে পড়তে চাইছিলেন, কিন্তু সাগরেদরা তাঁকে ঠেসে ধরে রাখল, তার মাঝে এক জন জোর করে বুকের মাঝে একটা তক্তা বিছিয়ে দিয়ে দুটো থান ইট এনে রেখে দেয়। আমি দেখতে পেলাম আতঙ্কে পীর বাবার চোখ গোল–গোল হয়ে উঠেছে, কী একটা বলে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ছাড়া পাবার জন্যে, কিন্তু সাগরেদরা তাঁকে কিছুতেই ছাড়ছে না। কালু খাঁয়ের লাখ টাকার লোভ খুব সহজ ব্যাপার নয়। গুণ্ডা গোছের এক জন লোক প্রকাণ্ড একটা হাতুড়ি নিয়ে হাজির হয়। পীরবাবার প্রচণ্ড চিৎকার অগ্রাহ্য করে সেই হাতুড়ির প্রচণ্ড আঘাতে সে থান ইট দুটি গুঁড়ো করে ফেলে। সাথে সাথে পীর বাবা এক গগনবিদারী চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠেন, দশ জন সাগরেদ তখন তাঁকে ধরে রাখতে পারে না, তিনি বাবা গো, মা গো, মেরে ফেলল গো বলে চিৎকার করে লাফাতে থাকেন। দর্শকরা হতচকিত হয়ে একেবারে নীরব হয়ে যায়। সাগরেদরা দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে রীতিমতো কুস্তির ভঙ্গিতে গদিতে আছড়ে ফেলল, বড় সাগরেদ তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে কী একটা বলতে থাকেন আর পীর সাহেব প্রবল বেগে মাথা নেড়ে আপত্তি করতে থাকেন। কয়জন সাগরেদ ছুটে গিয়ে ব্যান্ডেজ মলম এনে তাঁকে উল্টে ফেলে পিঠে একটা ব্যান্ডেজ করে দিল—সিল্কের সাদা পাঞ্জাবিতে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছিল, তাঁকে চেপে শুইয়ে রেখেই পাঞ্জাবি বদলে দেয়া হল।

উপস্থিত দর্শক তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কথাবার্তায় আসর রীতিমতো সরগরম। হঠাৎ দেখি নান্টু তার কাগজের বান্ডিল নিয়ে গুটিগুটি এগিয়ে আসছে। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে আটকে নিচু গলায় বললাম, এক্ষুনি নয়, আরেকটু পর।

খুশিতে নান্টুর দাঁত বেরিয়ে ছিল, সেগুলো লুকানোর কোনো চেষ্টা না করে বলল, আরো মজা আছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

নান্টু হাতে কিল মেরে বলল, নদী মে খাল, মিরচা মে ঝাল।

শেষ পর্যন্ত বড় সাগরেদ উঠে দাঁড়ালেন, কেশে গলা পরিষ্কার করতেই উপস্থিত জনতা একেবারে চুপ করে যায়। বড় সাগরেদ হুঙ্কার দিয়ে বললেন, আমি এক শ' বার বললাম যার অজু নাই সে যেন জিকিরে যোগ না দেন, কিন্তু আপনাদের মাঝে এক জন আমার কথা শুনেন নাই, অজু ছাড়া জিকিরে টান দিয়েছেন।

উপস্থিত জনতা পাংশু মুখে বসে থাকে। বড় সাগরেদ চিৎকার করে বললেন, হুজুরের জানের জন্যে যার মায়া নাই, জাহান্নামে তার জায়গা নাই। খবরদার বে–অজু মানুষ জিকিরে সামিল হবেন না।

পীর বাবা আবার জিকির শুরু করেন, এবারে তাঁর সাথে যোগ দিল অল্প কিছু লোক, অজু সম্পর্কে সন্দেহ নেই, এরকম লোকের সংখ্যা বেশি নয়। পীর বাবার সমাধিস্থ হতে বেশি সময় লাগল না। লাখ টাকার লোভ খুব সহজ জিনিস নয়। বড় সাগরেদ আবার উঠে দাঁড়িয়ে গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, হুজুরের রুহ্ এখন সাত আসমান সাত জমিন পার হয়ে উঠে গেছেন, হুজুরের শরীরে এখন

ব্যথা–বেদনা নাই। খবরদার, আপনারা কেউ শব্দ করবেন না, রুহ্ তাহলে শরীরে ফিরে আসতে চায়। তখন রুহের কষ্ট হয়, শরীরে আজাব হতে পারে। খোদার রহমত মানুষের শরীরে নাজেল হলে মানুষের শরীর ফিরিশতার শরীর হয়ে যায়। আপনারা এখন তার প্রমাণ দেখবেন।

আগুনের বড় কুণ্ডতে অনেকক্ষণ থেকে বেশ কয়টা কাঠের গুঁড়ি দাউদাউ করে জ্বলছিল, এবারে সাগরেদরা এসে গনগনে কয়লাগুলি সমানসমান করে বিছিয়ে দিতে থাকে। প্রায় দশ ফুট লম্বা দুই ফুট চওড়া জ্বলন্ত কয়লার একটা রাস্তা তৈরি হয়, পীর বাবা সেটার উপর দিয়ে হেঁটে যাবেন। আধো অন্ধকারে জ্বলন্ত কয়লার লাল আভা দেখে ভয় ভয় করতে থাকে, এর উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। সফদর আলী অবশ্যি বুঝিয়ে দিয়েছেন পা ভিজিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে গেলে ব্যাপারটি তেমন কঠিন নয়। আজ অবশ্যি অন্য ব্যাপার, সফদর আলী ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সব ভণ্ডামি আজ ধরা পড়ে যাবে। পেরেকের বিছানাটি এত চমৎকার কাজ করেছে যে এবারেও সফদর আলীর ব্যবস্থাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই!

পীর বাবা অনেকক্ষণ থেকেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন, সবাই মিলে তাঁর পা ভালো করে ধুয়ে দিয়ে ধরাধরি করে জ্বলন্ত কয়লার কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। পীর বাবা টলতে টলতে দুলতে দুলতে কোনোমতে দাঁড়িয়ে থাকেন। পিছন থেকে বড় সাগরেদ একটা ধাক্কা দিতেই তিনি এক পা কয়লার উপরে দিলেন। মুহূর্তে তাঁর ভাবগম্ভীর মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি এক লাফে পিছিয়ে আসতে চাইলেন। কিন্তু বড় সাগরেদ আবার তাঁকে ধাক্কা মেরে জ্বলন্ত কয়লার দিকে ঠেলে দিলেন। পীর বাবা নাক–মুখ খিঁচিয়ে কোনোমতে দুই পা সামনে এগিয়ে গেলেন, তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার করে বাবা গো, মা গো, মেরে ফেললে গো বলে লাফাতে লাফাতে জ্বলন্ত কয়লা থেকে বেরিয়ে এলেন। তার বিরাট থলথলে শরীর নিয়ে তিনি বারকতক ঘুরপাক খেয়ে বড় গামলা ভর্তি শরবতে নিজের পা ডুবিয়ে দিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকেন। এর মাঝে কয়েক বার ফ্লাশের আলো জ্বলে উঠল। আমার সাংবাদিক বন্ধু নিশ্চয়ই ছবি তুলে নিয়েছে।

উপস্থিত দর্শকেরা বিচলিত হয়ে ওঠে। তাদের শব্দ করা নিষেধ। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে। এখন শব্দ করে বা না করেই বা কি! আস্তে আস্তে বেশ একটা শোরগোল ওঠে, লোকজন কথাবার্তা বলতে থাকে উত্তেজিত স্বরে, আর তার মাঝে হঠাৎ নান্টুর রিনরিনে গলার স্বর শোনা গেল, পীর সাহেবের জোচ্চুরি, পীর সাহেবের জোচ্চুরি, পীর সাহেবের জোচ্চুরি—

ম্যাজিকের মতো সবাই চুপ করে যায়, পীর সাহেব পর্যন্ত তাঁর যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে থেমে যান। সবাই ঘুরে তাকায় নান্টুর দিকে। নিজের কানকে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। কয়েক মুহূর্তে সমস্ত ঘর একেবারে কবরের মতো নীরব, নিঃশ্বাস ফেললে শোনা যায় এরকম। নান্টু ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, ভয়ে ভয়ে পিছনে তাকায় একবার, দৌড় দিতে গিয়ে থেমে গেল, সম্ভবত বাকি দশ টাকার লোভে একটা কাগজ বের করে সে কাছাকাছি এক জনকে এগিয়ে দেয়, একসাথে কয়েকজন ঝুঁকে পড়ে সেই কাগজের উপর, সেখানে বড় বড় করে লেখা,

banglabook.com

"পীর সাহেবের জোচ্চুরি।"

তার নিচে দু'টি প্রশ্ন, "কেন আজ পীর সাহেব পেরেকের বিছানায় শুইতে পারিলেন না?" এবং "কেন আজ পীর সাহেব আগুনের উপর হাঁটিতে পারিলেন না?" প্রশ্নগুলোর নিচে ছোট ছোট হাতের লেখায় প্রশ্ন দু'টির উত্তর।

বেশ কয়েকজন কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসে নান্টুর দিকে, নান্টু সাহস করে বিলি করতে শুরু করে। এক জন দু'জন করে বেশ কয়েকজন পীর সাহেবের জোচ্চুরির বিবরণ পড়া শুরু করে। দরবারে একটা হৈচৈ শুরু হয়ে যায়, মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় যে পীর সাহেব একটা জোচ্চোর। হঠাৎ করে সবাই নান্টুকে ঘিরে ধরে এক কপি জোচ্চুরির বিবরণের জন্যে। আমি সবিস্ময়ে দেখি নান্টু হঠাৎ মুখে একটা গাম্ভীর্য এনে হাতের কাগজগুলো বুকে চেপে ধরেছে। লোকজন তাকে ভিড় করে রেখেছে, কিন্তু সে কাগজ হাতছাড়া করছে না, এক জন চাইতেই বলল, পাঁচ টাকা করে দাম, আজকে স্পেশাল রেট দুই টাকা। লোকটি বলল, আগে তো এমনিতেই দিচ্ছিলি—

নান্টু গম্ভীর গলায় বলল, সেইটা হল বিজনেস ট্যাকটিস। নদী মে খাল মিরচা মে ঝাল। নিতে চাইলে নেন না হয় রাস্তা দেখেন, আমার অন্য কাস্টমারের রাস্তা আটকাবেন না।

আমি সবিস্ময়ে দেখি, লোকজন পকেট থেকে টাকা বের করে কাগজ কিনে নিচ্ছে, এক জন দেখলাম দুটো কেনার চেষ্টা করল। কিন্তু নান্টু একটার বেশি কাউকে দিল না। দেখতে দেখতে কাগজ শেষ হয়ে যায়। নান্টু খুচরো টাকার বান্ডিল দুই হাতে ধরে রাখে। সবগুলো টাকা রাখার মতো বড় পকেট তার প্যান্টে নেই।

পীর বাবার সাগরেদরাও এক কপি "পীর বাবার জোচ্চুরি" কিনে এনে পড়তে শুরু করেছে। শেষ করার আগেই দেখা গেল তারা হঠাৎ পিছনের দরজা দিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করছে। উত্তেজিত জনতা দৌড়ে তাদের ধরে ফেলল, পীর বাবা অবশ্যি পালানোর চেষ্টা করেন নি। পায়ে বড় বড় ফোস্কা বেরিয়ে গেছে। শরবতের গামলায় পা ডুবিয়ে বসে আছেন। কেউ তাঁকে কোলে করে না নিলে এখান থেকে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। সাগরেদদের নিজেদের জান নিয়ে টানাটানি, এখন কে এই দু'মণি লাশ নিয়ে টানাটানি করবে?

যে সমস্ত ভক্ত মুরীদেরা একটু আগেই পীর বাবার পায়ের তলায় চুমো খাবার জন্যে মারামারি করছিলেন, এখন তাঁরাই পীর বাবাকে তাঁর সাগরেদদের সাথে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়েছেন। নেহায়েত বয়স্ক মানুষ, এছাড়া কিল-ঘুষি যে ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যেত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পীর বাবার দাড়িটি নকল কি না দেখার জন্যে কৌতূহলী দর্শকরা মাঝে মাঝেই একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে যাচ্ছিল, এতেই পীর বাবার ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। আমার সাংবাদিক বন্ধুটি দায়িত্বশীল মানুষ, এখানে এসেই আমার পরিকল্পনাটি ধরে ফেলেছিল, তখন-তখনি সে পুলিশে খবর দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। পুলিশ এখনো এসে পৌছায় নি, কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে পৌছে যাবে। পীর বাবা আর তাঁর সাগরেদরা তাহলে একটা শক্ত পিটুনি থেকে রেহাই পাবেন!

আমি আর সফদর আলী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে আসি। সাংবাদিক বন্ধু শেষ

banglabook.com

পর্যন্ত থাকতে চান। খুব নাকি একটা জমকালো খবর হবে। নান্টুকে সরানো গেল না, কোনোমতে তার বাকি দশ টাকা ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে এলাম। সে তখন বিরাট এক জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা বক্তৃতা দিচ্ছে। বক্তৃতাটি এরকম : আমাকে স্যার বললেন, পীর বেটাকে তো ধরিয়ে দিতে হয়, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা আছে। আমি বললাম, নদী মে খাল মিরচা মে ঝাল। বিপদের ভয় আমার নাই, হায়াত-মউত খোদার হাতে। ভালো কাজে জান দিতে হলে দিতে হয়। স্যার বললেন, বাপকা বেটা, চল্ তাহলে ঠিক করি কী করা যায়। তারপর আমি আর স্যার এককাপ চা আর একটা সিগারেট নিয়ে বসি—

আমি তো আর পাষণ্ড নই, কী ভাবে এরকম জমাট গল্পে বাধা দিই?

পরদিন ইচ্ছা করেই অফিসে একটু সকাল সকাল হাজির হলাম, মোড় থেকে খবরের কাগজ কিনে এনেছি কয়েকটা। এসে দেখি আমার আগেই অন্যেরা হাজির। সবাই সুলতান সাহেবের টেবিলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। খবরের কাগজের শেষ পৃষ্ঠায় "ভণ্ডপীরের দুর্ভোগ" নামে মস্ত বড় ফিচার ছাপা হয়েছে সেখানে। কাল নান্টু যে হ্যান্ডবিলটা বিলি করেছে তার পুরোটা ছাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার নিজের হাতে লেখা, গর্বে আমার বুক প্রায় দুই আঙুল ফুলে ওঠে। খবরের কাগজে কোথাও অবশ্যি আমার বা সফদর আলীর নাম নেই। ইচ্ছা করেই গোপন করা হয়েছে। পীর সাহেবের কোনো অন্ধ ভক্ত বা কোনো সাগরেদ আবার পিছে লেগে যাবে সেই ভয়ে। হ্যান্ডবিলের প্রথমে পেরেকের বিছানায় শোওয়া এবং আগুনের ওপর হাঁটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখা। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে লিখেছি, যেন পড়ে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে, মনে হয় ভালোই লিখেছি, কারণ যে-ই পড়েছে সে-ই সবকিছু বুঝে ফেলার মতো মাথা নেড়েছে। হ্যান্ডবিলের নিচের অংশ এরকম :

> *"কিন্তু পীর সাহেবের কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা নাই। তিনি যখন পেরেকের বিছানায় শয়ন করেন অথবা জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর হাঁটিয়া যান তখন কোনোরূপ ব্যথা অনুভব করেন না। কারণ তখন বেশি ব্যথা অনুভব হয় না। ইহার কারণ আগেই বলা হইয়াছে, আবার লিখিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতে চাহি না।*
>
> *কিন্তু যদি কোনোক্রমে পেরেকের বিছানার একটি মাত্র পেরেক একটু লম্বা হইয়া যায়, তখন শরীরের সমস্ত ওজন সবগুলো পেরেকে বিভক্ত না হইয়া ঐ একটি পেরেকের উপরে পড়িবে এবং অচিন্তনীয় যন্ত্রণার উদয় হইবে। ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য আজ গোপনে একটি পেরেকের উপর সুচালো একটি লৌহ-নির্মিত টুপি পরিধান করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলস্বরূপ পীর সাহেবের যন্ত্রণাকাতর নর্তন-কুর্দন আপনারা স্বচক্ষে অবলোকন করিবেন।*
>
> *জ্বলন্ত অঙ্গারের তাপধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম, তাই প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করিলে ইহার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব। যদি জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে কিছু ধাতব পদার্থ রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যাপারটি অন্যরকম হইবে, ধাতব পদার্থ প্রচুর তাপধারণ করিতে পারে এবং কেহ তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিলে চোখের পলকে পায়ে ফোস্কা পড়িয়া যাইবে।*

banglabook.com

পীর বাবার জোচ্চুরি ধরিবার জন্য গোপনে আগুনের মধ্যে কিছু নাট-বল্টু ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, পীর সাহেব যখন ঐ উত্তপ্ত নাট-বল্টুতে পা দিবেন তাঁহার সকল বুজরুকি ধরা পড়িয়া যাইবে।
ভাই সকল, আজিকার—"

এর পরে পীরদের পিছনে টাকাপয়সা এবং সময় নষ্ট না করে সেটি কী ভাবে ভালো কাজে ব্যয় করা যায় সেটি পরিষ্কার করে লেখা আছে।

খবরের কাগজটা পড়ে শেষ করে সুলতান সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, খাঁটি পীর পাওয়া কঠিন। পীর যদি খাঁটি মানুষই হবে, তাহলে টাকাপয়সার দিকে এত ঝোঁক কেন?

আজিজ খাঁ বললেন, হ্যাঁ, খামাখা পেটমোটা একটা পীরকে এতগুলো টাকা খাওয়ালাম। ছোট ছেলেটা কত দিন থেকে বলছিল, একটা ম্যাকানো সেট কিনে দিতে—

মাওলা সাহেব বললেন, এমনিতে আমার পিঠে ব্যথা, তার মাঝে সেদিন জোচ্চোর ব্যাটার লাথি খেয়ে—

সুলতান সাহেব বললেন, ইকবাল সাহেব, আসলে আপনার কথাই আমাদের আগে শোনা উচিত ছিল। পীর-দরবেশের পিছনে টাকা নষ্ট না করে টাকাগুলো একত্র করে গরিব বাচ্চাদের জন্যে দুধ বা পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করলে হত।

মাওলা সাহেব কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমরা এত জন মানুষ, সবাই যদি মাসে দশ টাকা করেও দিই অনেক টাকা উঠে যাবে।

ইদরিস সাহেব বললেন, ইকবাল সাহেব এসব ব্যাপার ঠিক বোঝেন। তাঁকে প্রেসিডেন্ট করে একটা কমিটি করে ফেললে কেমন হয়?

মাওলা সাহেব মাথা নেড়ে বললেন, মানুষকে দেখে বোঝা মুশকিল কার ভিতরে কী আছে। এই যে ইকবাল সাহেব, দেখলে মনে হয় মহা ধান্ধাবাজ। অথচ দেখেন ভিতরে কেমন একটা দরদি মন লুকিয়ে আছে।

তাহলে সেটাই ঠিক থাকল, বৃদ্ধ অ্যাকাউনটেন্ট বললেন, আমরা টাকাপয়সা ইকবাল সাহেবের হাতে দিয়ে দেব। ইকবাল সাহেব আপনি যা হয় কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন।

আকমল সাহেব মাথা চুলকে বললেন, ইকবাল সাহেবের কথাবার্তায় কখনো বেশি পাত্তা দিই নি। মাঝে মাঝে মনে হয় একটা-দুটো ভালো ভালো কথা বলেন। অফিস ছুটির পর আধাঘন্টা সবাই যদি বসি, ইকবাল সাহেব যদি একটু গুছিয়ে বলেন, কেমন হয় তা হলে?

সেকশান অফিসার লুফে নিলেন কথাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, খারাপ না আইডিয়াটা। ঐ সময়ে এমনিতে বাসে যা ভিড়!

আমি কথা বলার সুযোগ পাচ্ছিলাম না, শেষ পর্যন্ত যখন সবাই থামলেন, সুযোগ হল। বললাম, আমাকে একটা কথা বলতে দেবেন?

সবার হয়ে মাওলা সাহেব বললেন, তার আগে বলেন আপনি রাজি আছেন কি না।
ঠিক আছে।

সবার মুখে পরিতৃপ্তির একটা হাসি খেলে যায়। সেটাকে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ দিয়ে বললাম, আমার নামটাও তা হলে পাল্টে ফেলি, কী বলেন? হযরত শাহ বাবা জাফর ইকবাল নকশবন্দী কুতুবপুরী গুলগুলিয়া—কেমন শোনাচ্ছে নামটা?

ভুলও হতে পারে, কিন্তু মনে হল কারো কারো চোখ এক মুহূর্তের জন্যে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

হেরোইন কারবারি

কয়দিন থেকেই শরীরের অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় ব্যথা। মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে যায়, তারপরে আর ঘুম আসতে চায় না। অফিসে একজনকে কথা প্রসঙ্গে বলে ফেললাম, শুনে তিনি খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, কী হল?

না, কিছু না। তবে সহকর্মী একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, আমার বড় শালার আপন ভায়রা ভাইয়ের ঠিক এরকম লক্ষণ ছিল।

কী হয়েছে তার?

না, কিছু না, শুনে আপনি আবার ভয় পেয়ে যাবেন।

না শুনেই আমি ভয় পেয়ে গেছি, তবু শুনতে চাইলাম, বলুন না, শুনি।

ব্রেন ড্যামেজ আর হার্ট অ্যাটাক একসাথে। ডাক্তার পরে কেটেকুটে দেখেছে লিভার বলতে নাকি কিছু ছিল না। কিডনি দুটোও নাকি একসাথে ফেইল করেছিল। সিগারেট খেত, তাই লাংসের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

আমি হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলাম। বসে থাকতে থাকতে আমার 'হার্ট' এবং 'ব্রেন' ব্যথা করতে থাকে। পিঠের কাছে অনেকক্ষণ থেকে শির শির করছে, মনে হয় কিডনি দুটোও কেমন জানি হাল ছেড়ে দিচ্ছে। লিভারটা কোথায় ঠিক জানি না, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারি সেটাও প্রায় যায়-যায়। সিগারেট খেয়ে খেয়ে নিশ্চয়ই বুকের বারটা বাজিয়ে ফেলেছি। কারণ একটু পরে আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে থাকে। দুপুর পর্যন্ত বেঁচে থাকব কি না সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু বাঁচার শেষ চেষ্টা না করে হাল ছেড়ে দিই কেমন করে? ছুটি নিয়ে আমি তখন-তখনই বের হয়ে পড়লাম আমার এক ডাক্তার বন্ধুর সাথে দেখা করতে। রিকশা করে যেতে-যেতে আমার হাত এবং পায়ের তালু ঘামতে শুরু করে, ডাক্তার বন্ধুর অফিস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব কি না সেটা নিয়েই এখন আমার সন্দেহ শুরু হয়ে গেল।

আমার ডাক্তার বন্ধুটি আমাকে অনেকক্ষণ টেপাটেপি করে দেখল। পাছে সে জিনিসটা হেসে উড়িয়ে দেয়, আমি তাই আমার সহকর্মীর শালার আপন ভায়রা ভাইয়ের ঘটনাটি খুলে বললাম। সে মন দিয়ে শুনে মাথা নেড়ে বলল, তোমার অবস্থা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমি ঠিক জানি না কত দূর কি করতে পারব। কিন্তু চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, কী মনে হয় তোমার? বেঁচে যাব এ যাত্রা?

দেখি, অসুখটা তো সহজ নয়।

কি নাম অসুখটার?

অসুখ তো একটা নয়, অনেকগুলো। তাই এর ঠিক একটা নাম নেই। তবে যার এই অসুখগুলো হয় তার নাম হাইপোকনড্রিয়াক।

হাইপোকনড্রিয়াক! কী বীভৎস নাম! কোথায় যেন শুনেছি নামটা ঠিক মনে করতে পারলাম না। ডাক্তার বন্ধুটি একটা বড় ওষুধের বাক্স ধরিয়ে দিয়ে বলল, বাসায় গিয়ে শুয়ে থাক। খাওয়ার পর দুটো করে ট্যাবলেট দিনে দশ বার—খবরদার ভুল যেন না হয়।

আমি চলে আসার সময় বলল, তোমার আর আসতে হবে না, রাতে আমি আসব। খালাম্মা ভালো আছেন তো? আর শোন, ভালো-মন্দ যদি কিছু খেতে চাও, খেয়ে নিও। বুঝতেই তো পারছ দু'দিনের দুনিয়া!

ডাক্তার যখন রোগীকে বলে, দু'দিনের দুনিয়া—ভালো-মন্দ কিছু খেয়ে নিও, তখন রোগীর মানসিক অবস্থা কেমন হয় সেটা নিশ্চয়ই আর বুঝিয়ে দিতে হয় না। আমি কোনোমতে রিকশা করে বাসায় রওনা দিই, মাথা ঘুরতে থাকে আমার। মনে হয় পড়ে যাব রিকশা থেকে। কাওরান বাজারের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ চায়ের দোকানে সফদর আলীকে দেখে রিকশা থামিয়ে নেমে পড়লাম। মরি-বাঁচি ঠিক নেই, সফদর আলীর সাথে একবার দেখা করে যাই। সফদর আলী আমাকে দেখে একটু চমকে ওঠেন। বললেন, সে কী! আপনার এ কী চেহারা! কী হয়েছে?

অনেককিছু। একটা অসুখ তো নয়, অনেকগুলো।

কী সর্বনাশ! কবে হল?

এই তো, অনেকদিন থেকে নিশ্চয়ই। মরি-বাঁচি ঠিক নেই।

কিসের অসুখ?

অসুখটার নাম জানি না, তবে যার হয় তাকে বলে হাইপোকনড্রিয়াক।

কী বললেন?

হাইপোকনড্রিয়াক।

কে বলেছে আপনাকে?

আমার মনে হল সফদর আলীর মুখে একটা হাসি উঁকি দিয়ে গেল। একটু রেগে বললাম, আমার এক বন্ধু ডাক্তার আছে, মস্ত বড় ডাক্তার—

সফদর আলী সত্যি দুলে দুলে হাসতে থাকেন। বিজ্ঞানী মানুষের দয়া-মায়া একটু কম হয় জানতাম, কিন্তু এরকম নিষ্ঠুর হয় ধারণা ছিল না। বললাম, হাসছেন কেন আপনি?

হাইপোকনড্রিয়াক মানে জানেন না আপনি?

না।

হাইপোকনড্রিয়াক মানে হচ্ছে যার কোনো অসুখ নেই, কিন্তু মনে করে তার অনেক বড় বড় অসুখ আছে।

আমি হতবাক হয়ে থেমে গেলাম। সত্যিই তো! আমিও তো জানতাম শব্দটা, এখন এই ভয়ে মাথা গুলিয়ে রয়েছে বলে ধরতে পারি নি। থতমত খেয়ে বললাম, কিন্তু

banglabook.com

এত বড় বাক্স ভরা ওষুধ দিল যে!

খুলুন দেখি বাক্সটা।

আমি বাক্সটা খুলি। বড় বাক্সের ভেতর একটা মাঝারি বাক্স। মাঝারি বাক্সের ভেতর একটা ছোট বাক্স। ছোট বাক্সটা খুলে দেখি তার ভেতরে কয়টা চিনাবাদাম।

লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। পাজি বন্ধুটা বলেছে, রাতে আমার বাসায় আসবে, এসে সবার সামনে আমাকে নিয়ে কী ঠাট্টাই না করবে! চিন্তা করে আমার কালঘাম ছুটে যাচ্ছিল। কিন্তু সাথে সাথে আমার আবার ভালোও লাগতে থাকে যে আসলে আমার কোনো অসুখ হয় নি। বুক হালকা হয়ে যায়, শরীর ভালো লাগতে থাকে, হার্ট, কিডনি, লিভার সবকিছু একসাথে ঝরঝরে হয়ে ওঠে।

আমি আর সফদর আলী বসে বসে চিনাবাদামগুলো শেষ করে দিই।

রাতে আমার ডাক্তার বন্ধুটি সত্যি সত্যি তার গাড়ি হাঁকিয়ে এসে হাজির। অনেক দিন থেকে আমার সাথে জানাশোনা, বাসার সবাইকে চেনে। আমাকে নিয়ে বাসার সবার সামনে অনেকক্ষণ খুব হাসাহাসি করল। আমি কী ভাবে অচল হার্ট, ব্রেন, লিভার, কিডনি আর লাংস নিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে তার চেম্বারে এসে হাজির হলাম, সেটা সে বেশ কয়েকবার অভিনয় করে দেখাল। যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেল আমার লজ্জা পাবার কিছু নেই, মানুষ যখন খুব কাজের চাপে থাকে তখন এধরনের শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়। কয়দিন ছুটি নিয়ে কোথাও থেকে ঘুরে এলে সব নাকি ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার বন্ধুটি আমাকে সপ্তাহ দুয়েকের ছুটি নিয়ে কোনো জায়গা থেকে ঘুরে আসতে বলল।

আমার সপ্তাহ দুয়েকের ছুটি পাওনা ছিল। ঠিক করলাম ছুটিটা নষ্ট না করে কোথাও থেকে ঘুরে আসি। একা একা কোথাও গিয়ে মজা নেই। কাকে নেয়া যায়, কোথায় যাওয়া যায় জল্পনা–কল্পনা করতে থাকি। কক্সবাজার, বান্দরবন, সুন্দরবন, সীতাকুণ্ড, সিলেটের চা বাগান, ময়মনসিংহের গারো পাহাড়—যাওয়ার জায়গার অভাব নেই, তবে উপযুক্ত সঙ্গীর খুব অভাব। হঠাৎ আমার সফদর আলীর কথা মনে পড়ে, তাঁকে যেরকম ব্যস্ত দেখায়, বেড়াতে যেতে রাজি করাতে পারব এমন বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বলামাত্র এককথাতে রাজি হয়ে গেলেন! আসলে সফদর আলী ঘুরে বেড়াতে খুব পছন্দ করেন। এমন জায়গা নেই তিনি যেখানে যান নি, ঘুরে ঘুরে তিনি পোক্ত হয়ে উঠেছেন। যখন আমি বললাম, কোথায় গিয়ে কোথায় উঠব, কোথায় থাকব—সফদর আলী তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার উপর ছেড়ে দিন, ভ্রমণবন্দিটা নিয়ে নেব, কোনো অসুবিধে হবে না।

ভ্রমণবন্দি! সেটা কী জিনিস?

সফদর আলী একটু লাজুকভাবে হেসে বললেন, ভ্রমণের সময় যা যা লাগে, সব একটা ঝোলার মাঝে বন্দি করে রাখা আছে, তাই এর নাম ভ্রমণবন্দি। কোথাও যেতে হলে আমি ঘাড়ে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কী কী আছে ভ্রমণবন্দির ভেতরে?

একটা চুম্বক, ইনডাকশান কয়েল, তামার তার, একটা আলট্রাসোনিক অসিলেটর, একটা ছয় ভোল্টের ব্যাটারি—

banglabook.com

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, ভ্রমণ করতে এসব লাগে নাকি? এই চুম্বক, ব্যাটারি?

কী বলছেন আপনি? রাঙামাটি পাহাড়ে যখন হারিয়ে গেলাম, কী কুয়াশা, কোনদিকে যাব জানি না। চুম্বকটা ঝুলিয়ে দিতেই উত্তর-দক্ষিণ বের হয়ে গেল, তারপর হাতড়ে হাতড়ে আধ ঘন্টায় তাঁবুতে ফিরে এলাম।

তাঁবু? আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি তাঁবুতে থাকেন?

রাঙামাটির ঐ পাহাড়ে আমার জন্যে হোটেল কে বানাবে?

সাপখোপ?

ইনডাকশান কয়েল কি শুধু শুধু নিই? তাঁবুকে ঘিরে তামার তার থাকে, ইনডাকশান কয়েল দিয়ে হাই ভোল্টেজ করে রাখি, সাপখোপ ধারে-কাছে আসে না।

আমি ঢোক গিলে বললাম, আমাদের কি তাঁবুতেই থাকতে হবে?

থাকার জায়গা না থাকলে তাঁবুতে থাকব। আমার দুটো স্লিপিং ব্যাগ আছে, আপনার জন্যে একটা নিয়ে নেব।

বন-জঙ্গলে তাঁবুতে থাকতে ভয় করে না আপনার?

কী বলেন আপনি, ভয় করে না আবার? ভীষণ ভয় করে! সফদর আলী শিউরে ওঠেন একবার।

আপনি কি বন্দুকটন্দুক নিয়ে যান?

বন্দুক? সফদর আলী এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বললেন, বন্দুক দিয়ে কী করব? ভূতকে কখনো গুলি করা যায়?

আপনি ভূতের ভয় পান? জঙ্গলে আপনি ভূতের ভয় পান? আমি অবাক হয়ে সফদর আলীর দিকে তাকিয়ে থাকি।

আপনি কী ভাবছিলেন?

এই, বাঘ-ভালুক—

বাঘ-ভালুককে ভয় পাবার কী আছে? গায়ে বাঘবন্দি তেল মেখে ঘুমাবেন, বাঘ ধারে-কাছে আসবে না। আলট্রাসোনিক বিপার আছে, বিপ বিপ শব্দ করতে থাকে, পোকা-মাকড় পর্যন্ত পালিয়ে যাবে।

ওরকম শব্দ করতে থাকে, তার মাঝে আপনি ঘুমান কেমন করে?

সফদর আলী একটু হেসে বললেন, ঐ তো বললাম না আলট্রাসোনিক শব্দের কাঁপন এত বেশি যে মানুষ শুনতে পায় না, কিন্তু পশুপাখি পোকা-মাকড় ঠিকই শোনে।

আমি মাথা চুলকে বললাম, বন-জঙ্গলে এই অন্ধকারে একা একা তাঁবুতে—

— অন্ধকার? অন্ধকার আপনাকে কে বলল?

রাতে অন্ধকার হবে না, বাতি জ্বালিয়ে আলো আর কতটুকু পাওয়া যায়?

বাতি আমি কখনোই জ্বালাই না, পোকা মাকড় এসে ভিড় করে। আমার ইনফ্রারেড চশমাটা পরে নিই, পরিষ্কার দেখা যায় তখন।

ইনফ্রারেড চশমা? সেটা কী জিনিস?

সফদর আলী হঠাৎ গলা নামিয়ে ফেললেন। ফিসফিস করে বললেন, খবরদার, কাউকে যেন বলবেন না, অন্ধকারে দেখা যায় এরকম চশমার জন্যে সবরকম লোক

banglabook.com

ব্যস্ত হয়ে আছে।

এদিক-সেদিক তাকিয়ে যখন দেখলেন কেউ তাঁর কথা শুনছে না, তখন আমাকে বোঝালেন, ইনফ্রারেড চশমাটি কী জিনিস। আমরা যে আলো দেখতে পাই তার দৈর্ঘ্য যদি বেশি বা কম হয়ে যায়, তাহলে সেটাকে আর দেখা যায় না। যেসব আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি, তাকে ইনফ্রারেড বলে, সেটা নাকি আশ্চর্য কিছু নয়, যে কোনো গরম জিনিস থেকেই অদৃশ্য ইনফ্রারেড আলো ছড়ায়। সফদর আলী একটা চশমা তৈরি করেছেন, যেটা এই ইনফ্রারেড আলোকে সাধারণ আলোতে পরিণত করে দেয়। তাকে সেজন্যে কয়েকটা সি. সি. ডি. ব্যবহার করতে হয়েছে। সেটা কী জিনিস সফদর আলী আমাকে অনেকক্ষণ বোঝানোর চেষ্টা করলেন। আমি তবু ঠিক বুঝতে পারলাম না। যেটুকু বুঝলাম তাতেই চমৎকৃত হলাম, একটা পেশাদার চোর একটা ইনফ্রারেড চশমা পেলে কী খুশি হবে, সেটা আমার জন্যে কল্পনা করাও মুশকিল।

সফদর আলী ভ্রমণের জন্যে আরো কী কী আবিষ্কার করেছেন বললেন, তার "মাংস গুল্লি" 'মাছ গুল্লি" এবং সবজি গুল্লি বলে এক ধরনের ট্যাবলেট রয়েছে, সেগুলো মাংস, মাছ বা সবজিতে ছেড়ে দিয়ে পানি দিয়ে গরম করে নিলেই নাকি রান্না হয়ে যায়। তাঁর সেগুলো বেশি ব্যবহার করতে হয় না, কারণ তাঁর যে "স্বাস্থ্য গুল্লি" আছে, সেটা একটা খেলেই নাকি সারা দিন কিছু খেতে হয় না। এ ছাড়া আছে তাঁর দশবাহারি চুলো, মগ, ডেকচি, সসপ্যান, বালতি, চাকু, শাবল, কোদাল, টেবিল-ল্যাম্প এবং ইঁদুর মারার কল। এই দশটি জিনিসের কাজ করতে পারে বলে এর নাম দশবাহারি চুলো। তার আরেকটি আবিষ্কারের নাম হচ্ছে বাইনো ক্যামেরা। সেটা একই সাথে বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা। শুধু তা-ই নয়, সে ক্যামেরাতে নাকি ত্রিমাত্রিক ছবি ওঠে। সফদর আলীর সবচেয়ে মজার আবিষ্কার হচ্ছে "ভূতটিপি", এটি আসলে একটি ছোট ক্যাসেট রেকর্ডার। ভয় পেলেই এটা তিনি টিপে দেন। তখন সেটা ক্রমাগত আয়াতুল কুরসি পড়তে থাকে। আয়াতুল কুরসি পড়লে নাকি কখনো ভূত ধারে-কাছে আসে না।

আমরা আমাদের যাওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকি। ঠিক করা হল দু'সপ্তাহের জন্যে কক্সবাজার যাব, সেখান থেকে এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করা যাবে। বান্দরবন কাছেই, সেখানে শঙ্খ নদী দিয়ে পাহাড়ের ভেতর পর্যন্ত যাওয়া যায়। খুব নাকি সুন্দর জায়গা। ঢাকা থেকে চাটগাঁ পর্যন্ত ট্রেনে যাব, সেখান থেকে বাস। রাতের ট্রেনে রওনা দিলে ভোরে চাটগাঁ পৌঁছে যাব, তাহলে দিন থাকতে থাকতে কক্সবাজারে হাজির হওয়া যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই আমি স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। সাথে একটা স্যুটকেস আর একটা ছোট ব্যাগ। মা জোর করে একটা টিফিন ক্যারিয়ার ধরিয়ে দিয়েছেন, ভেতরে মাংস-পরোটা থাকার কথা। টিকিট আগে থেকে কিনে রেখেছিলাম, তাই স্টেশনের সামনে সফদর আলীর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে তিনি এসে হাজির। তাঁকে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম, পিঠে একটা অতিকায় ঝোলা নানারকম বেল্ট